হার্ড ইমিউনিটিই কি অনিবার্যতা?

আসলে মুখে না বললেও, রাষ্ট্র হার্ড ইমিউনিটির তত্ত্বের উপরই ভরসা করছে। মাঝখান থেকে আরও কিছু মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাবেন।

By: Manabesh SarkarKolkata April 25, 2020

করোনা মোকাবিলার সরকারি পদক্ষেপগুলি যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপরই সবকিছু নির্ভর করবে, এমন আশঙ্কা অমূলক নয় (ছবি- গজেন্দ্র যাদব)

এবছর ৩০ জানুয়ারী, যেদিন ভারতে প্রথম নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের প্রমাণ মেলে, সেদিনই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এই সংক্রমণকে 'আন্তর্জাতিকভাবে উদ্বেগজনক জনস্বাস্থ্যের আপৎকালীন পরিস্থিতি' বলে ঘোষণা করে। এর দেড় মাস বাদে ১৪ই মার্চ ভারত সরকার করোনাকে 'বিপর্যয়' বলে ঘোষণা করে। ভারতে তখন আক্রান্তের সংখ্যা ৮২ এবং মৃত ২। দশ দিন বাদেই ২৪ মার্চ, দেশজোড়া

লক-ডাউন ঘোষণার সময় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩৪ এবং মৃতের সংখ্যা ৯। এই লেখার সময়, দেশজোড়া লক-ডাউনের ২৮তম দিনে, এই সংখ্যাদুটি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৮৬০১ ও ৫৯০। সংক্রমণের মাত্রা আরও বেশি ধরা পড়ত, যদি নমুনা পরীক্ষায় সরকারি নিয়মের গেরো কিছুটা কম থাকত। এই পরিস্থিতিতে সরকার সংক্রমণ রুখতে দেশকে যতই 'রেড', 'অরেঞ্জ' এবং 'গ্রিন' জোনে ভাগ করুক না কেন, লক-ডাউন উঠে গেলে কোনো 'অরেঞ্জ' জোন যে 'রেড' জোনে বা 'গ্রিন' জোন 'অরেঞ্জ' জোনে পরিবর্তিত হবে না, এমনটা বলা যায় না। ফলে করোনা মোকাবিলার সরকারি পদক্ষেপগুলি যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপরই সবকিছু নির্ভর করবে, এমন আশঙ্কা অমূলক নয়।

পুঁজিবাদের কবর খুঁড়তেই যেন করোনাভাইরাসের আবির্ভাব

অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। জানুয়ারীর শেষে 'হু' যখন 'জনস্বাস্থ্যের আপৎকালীন পরিস্থিতি'র কথা বলে, তখন করোনা ভাইরাসের সংহারমূর্তি চিনের বাইরে আর কোথাওই প্রকাশ পায় নি। চিনের বাইরে ১৮টি দেশে তখন শুধুমাত্র সংক্রমণের প্রমাণ মিলেছিল, ভারত যার অন্যতম। ভারতে করোনা যাতে অনুপ্রবেশের স্তর থেকে বিশেষ এগুতে না পারে, তার জন্য আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রীদের উপর তখন কিছু বিধিনিষেধ জারি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে শুধুমাত্র চিন ছাড়া আর কোন দেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হয়েছিল না।

৫ ফেব্রুয়ারি একটি নির্দেশে চিন থেকে আগত ভারতীয়দের জন্য ১৪ দিনের কোয়ারাণ্টিন বাধ্যতামূলক করা হয় এবং সেখান থেকে কোন বিদেশি নাগরিকের ভারতে আসার ভিসা বাতিল করা হয়। এর তিন সপ্তাহ বাদে দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান এবং ইতালি থেকে আগত বিমান যাত্রীদের কোয়ারাণ্টিনে রাখার সম্ভাবনার কথা বলা হলেও, তা বাধ্যতামূলক করা হয় না। অথচ সে সময় দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান এবং ইতালিতে করোনা ভাইরাস ভালোভাবেই জাঁকিয়ে বসেছিল। মার্চের শুরুতে উল্লেখিত দেশগুলি ও জাপান থেকে আসা বিমান যাত্রীদের জন্য কোয়ারাণ্টিন বাধ্যতামূলক করা হয় এবং ঐ সমস্ত দেশ থেকে ভারতে আসার ভিসা বাতিল করা হয়।

১১ মার্চ যেদিন হু'র মহানির্দেশক নভেল করোনা ভাইরাসকে একটি 'বিশ্বব্যাপী ব্যাধি' বলে ঘোষণা করেন, সেদিনই কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত বিদেশি নাগরিকদের ভারত আসার ভিসা বাতিল করে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ১১ মার্চের নির্দেশে মাত্র ৭টি দেশ (চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স এবং জার্মান) থেকে আগত বিমান যাত্রীদের জন্য কোয়ারাণ্টিন বাধ্যতামূলক করা হয়, যা 'বিপর্যয়' ঘোষণার পরও অপরিবর্তিত থাকে। অথচ আমেরিকা বা ব্রিটেনের মত দেশও তখন করোনা ভাইরাসের থাবায়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম করোনার সংক্রমণ ধরা পড়ে

ব্রিটেন থেকে আসা এক ভারতীয় নাগরিকের শরীরে। এখানে এটাও উল্লেখ করা দরকার যে, বিমানবন্দরগুলিতে সে সময় যে 'থার্মাল স্ক্রিনিং' চলছিল, তা উপসর্গ নেই এমন সংক্রমিত ব্যক্তিদের জন্য অর্থহীন।

ইঞ্চিতে মাপা সামাজিক দূরত্ব

শেষ পর্যন্ত 'বিশ্বব্যাপী ব্যাধি' ঘোষণার এক সপ্তাহ বাদে বিদেশ থেকে আসা যে কোন বিমান যাত্রীর জন্য কোয়ারাণ্টিন বাধ্যতামূলক করা হয়, যদিও তার একদিন পরে সমস্ত আন্তর্জাতিক উড়ান বন্ধের নির্দেশ জারি হয়। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে এটা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, করোনার অনুপ্রবেশ আটকাতে আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রীদের জন্য যথাসময়ে বিধিনিষেধগুলি চালু হয়েছিল না। ফলে ২৪ মার্চ যখন দেশজোড়া লক-ডাউন ঘোষিত হয়, তখন বাস্তবিকই করোনা নিঃশব্দে অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। আর এভাবেই করোনাকে আটকানোর প্রথম সুযোগ আমরা হাতছাড়া করেছি।

তবে করোনার অনুপ্রবেশকে রুখে দেওয়ার প্রাথমিক সুযোগ হাতছাড়া হলেও, পর্যাপ্ত মাত্রায় সন্দেহভাজনদের নমুনা পরীক্ষা করার মাধ্যমে এই বিপদকে সামলে দেওয়ার সুযোগ ছিল। উপসর্গযুক্ত ও উপসর্গহীন উভয় ধরণের সন্দেহভাজনদের পরীক্ষা করে আক্রান্তদের চিহ্নিত করা, চিকিৎসা করা ও তাঁদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের খুঁজে বার করে কোয়ারাণ্টিনে পাঠানো বা অন্য ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তা করা যেত। বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী এটাই করোনার গোষ্ঠী সংক্রমণ আটকানোর উপায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম থেকেই পর্যাপ্ত সংখ্যায় নমুনা পরীক্ষা করার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায় না। এমনকি 'বিপর্যয়' ঘোষণার পরও, প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত উপসর্গহীন সন্দেহভাজনদের কোনো নমুনা পরীক্ষা করা হয় না। প্রধানমন্ত্রীর 'জনতা কার্ফু' ঘোষণার পরের দিনই প্রথম উপসর্গহীন সন্দেহভাজনদের নমুনা পরীক্ষার নীতি গৃহীত হয়।

তবে সেক্ষেত্রেও করোনা ধরা পড়েছে এমন রোগীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসা উপসর্গহীন ব্যক্তি যদি বিশেষ ঝুঁকিসম্পন্ন হন, তবেই তাঁর নমুনা পরীক্ষার কথা বলা হয়। এই লেখার সময় পর্যন্ত এই প্রশ্নে নীতি নির্ধারক সংস্থা আই.সি.এম.আর.-এর এটাই অবস্থান। এমনকি ভারতের ৮০ শতাংশ সংক্রমণ উপসর্গহীন বা অতিসামান্য উপসর্গযুক্ত বলার পরও আই.সি.এম.আর.-এর পদস্থ কর্তা, রামন গঙ্গাখেড়কর, এই নীতিতে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। উপসর্গযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও, আই.সি.এম.আর.-এর নীতি অনুযায়ী, কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে তবেই আর.টি.-পি.সি.আর. টেস্টের কথা বলা হয়েছে। এর ফলে লক-ডাউনের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতেও দেখা যায় যে, দেশে প্রতি ১০ লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র ৩২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে; লক-ডাউনের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরুতে যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৯৮।

মহামারীকালে দায়িত্ব ভাগাভাগি

অথচ এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দেশ দক্ষিণ কোরিয়া একসময় প্রতি ১০ লক্ষ মানুষে ৭,৭১০ জনের নমুনা পরীক্ষা করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গ এবিষয়ে দেশের বড় রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে নীচে – লক-ডাউনের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরুতে প্রতি ১০ লক্ষে ৩৯। কম মাত্রায় পরীক্ষার কারণ হিসেবে টেস্ট কিটের অভাব বা ল্যাবরেটারির অভাব নিয়ে যে চাপানউতোর, তা আসলে এই বিষয়ে প্রস্তুতির অভাবের লক্ষণ। অথচ হু'র আপৎকালীন পরিস্থিতির ঘোষণা ও কেন্দ্রের 'বিপর্যয়' ঘোষণার মধ্যে সময়ের ব্যবধান দেড় মাস, যা এই সংক্রান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। নমুনা পরীক্ষার সমস্যা মেটাতে সম্প্রতি 'হট স্পট' এলাকার জন্য কম নির্ভরযোগ্য হলেও 'র‍্যাপিড টেস্ট'-এর কথা বলা হয়েছে। তবে তা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কতটা সহায়ক হবে, তা দেখার অপেক্ষা রাখে। যাই হোক, সন্দেহভাজনদের পর্যাপ্ত মাত্রায় পরীক্ষা না করার ফলে, লক-ডাউনের চতুর্থ সপ্তাহ শেষ হওয়ার পরও বোঝা যাচ্ছে না যে, আমরা বারুদের স্তূপের উপর বসে আছি কিনা।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য এ কথাটা আরও বেশি সত্য, কারণ এখানে চিত্রটা আরও বেশি অধরা। সংক্রমণের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাবেই, গোষ্ঠী সংক্রমণের আতঙ্কে ষড়যন্ত্রমূলক কায়দায় দেশজোড়া লক-ডাউন ঘোষণা করা হয়; যার ফলে পরিযায়ী শ্রমিকরা ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়েন। ল্যানসেটের একটি সাম্প্রতিক সম্পাদকীয়তে খুব সঠিকভাবেই বলা হয়েছে, 'উহানে লক-ডাউন লাগু করার সময় তা খুবই নির্মম মনে হলেও এখন তা মামুলি ব্যাপার হয়ে উঠছে। অথচ বহু দেশই করোনাকে আটকে রাখার জন্য ব্যাপক মাত্রায় পরীক্ষা, কোয়ারান্টিন, আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা মানুষদের খোঁজ এবং সামাজিক (পড়ুন শারীরিক) দূরত্বের মত হু'র নির্দেশিকাগুলি সঠিকভাবে অনুসরণ করছে না'।

ভারতের মত অত্যন্ত জনঘনত্বের দেশে যেখানে বহু পরিবারেই সদস্যদের এক ঘরের মধ্যে বাস করতে হয় বা যেখানে বহু শহুরে বস্তিতেই প্রত্যেক পরিবারের জন্য আলাদা করে জল বা পায়খানার ব্যবস্থা নেই, সেরকম একটি দেশে করোনার গোষ্ঠী সংক্রমণের পরিণতি খুবই ভয়াবহ। বিপুল জনসংখ্যা কিন্তু দুর্বল স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, এই ভয়াবহতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ফলে গোষ্ঠী সংক্রমণের ন্যূনতম সম্ভাবনাকেও নির্মূল করে ফেলা এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রিন জোন নয়, লকডাউন তুলতে প্রয়োজন গ্রিন কর্মিগোষ্ঠী গড়ে তোলা

কিন্তু রোগ হওয়ার আগেই রোগকে আটকানো – জনস্বাস্থ্যের এই নীতির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি বলে, আমরা গোষ্ঠী সংক্রমণ আটকানোর প্রারম্ভিক সুযোগগুলো হাতছাড়া করেছি। এমনকি দুর্বল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উপর দাঁড়িয়েও যেটুকু পরিষেবা দেওয়া সম্ভব, তাকে সুরক্ষিত করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিকল্পনায়, 'ফিভার ক্লিনিক'সহ বিভিন্ন প্রাথমিক পর্বের কাজে

যুক্ত ডাক্তার বা নার্সদের জন্য শুধুমাত্র এন-৯৫ মাস্ক ও গ্লাভসের কথা বলা হয়েছে। পি.পি.ই.-র মত সুরক্ষা কিট শুধুমাত্র 'আইসোলেশন' ওয়ার্ড এবং 'আই.সি.ইউ.' বা 'ক্রিটিকাল কেয়ার'-এ কর্মরত ডাক্তার ও নার্সদের জন্য বলা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি এই অবহেলার মনোভাবকে হাততালি দিয়ে আড়াল করার যে চেষ্টা, তা ক্রমশ প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। হাওড়া জেলা হাসপাতাল বা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের সংক্রমিত হওয়ার ঘটনা তারই উদাহরণ। যদিও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে অপ্রতুল স্বাস্থ্যকর্মীদের এই সম্পদকে কিছুটা হলেও রক্ষা করা যায়।

যাই হোক, এটা এখন দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে 'হু'-এর আপৎকালীন পরিস্থিতির সতর্কবার্তাকে কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ গুরুত্ব দেয় নি। তাই উপযুক্ত সময়ে করোনাকে মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না নেওয়ার ফলে, দেশ এখন এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। পর্যাপ্ত মাত্রায় সন্দেহভাজনদের নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা না করে, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা না করে, পরিযায়ী শ্রমিকদের আগাম ঘরে ফেরার ব্যবস্থা না করে মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন নিয়ে রাষ্ট্র যে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ দেখিয়েছে, তাকে আড়াল করার জন্য তবলিগি জামাতের ঘটনাকে বা বাজার-হাটে মানুষের জমায়েতকে সমস্ত সমস্যার উৎস বলে দেখানো হচ্ছে।

লক-ডাউনের সময়সীমা বৃদ্ধি করোনা মোকাবিলায় যে অগ্রগতি দাবি করে, তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বলে, এখন আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যার পরিবর্তে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। অঙ্কের এই খেলাকে কাজে লাগিয়ে পরিস্থিতির উন্নতি দাবি করা হচ্ছে। আসলে মুখে না বললেও, রাষ্ট্র হার্ড ইমিউনিটির তত্ত্বের উপরই ভরসা করছে। মাঝখান থেকে আরও কিছু মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাবেন। আর যাঁরা তা মানতে চাইবেন না, তাঁরা হয়ত বাঁচার জন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের অভাবনীয় লং মার্চের মত এমন কিছু করবেন, যা রাষ্ট্র ও সমাজের কল্পনার বাইরে। করোনা আতঙ্কের মধ্যেও রেশন নিয়ে, ত্রাণ নিয়ে, মজুরি নিয়ে যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে, তা সেই অজানা ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিতবাহী।

(মানবেশ সরকার প্রতীচী ইন্সটিট্যুটে কর্মরত, মতামত ব্যক্তিগত)